#আমি পদ্মজা পর্ব ১২

____

বট গাছের সামনে চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লিখন।
শীতের শুষ্কতায় বটগাছের অধিকাংশ পাতা ঝরে পড়েছে। লিখনের কাছে শীতকাল খুবই অপছন্দের ঋতু। শীত চরম শুষ্কতার রূপ নিয়ে প্রকৃতির ওপর জেঁকে বসে থাকে যা সহ্য হয় না লিখনের। ঠান্ডা লেগেই থাকে। ছোট থেকে কয়েকবার নিউমোনিয়ায় ভুগেছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে রুক্ষতা, তিক্ততা ও বিষাদের প্রতিমূর্তি শীতকাল। তখন পদ্মজা এতো দ্রুত

হাঁটছিল যে মনে হচ্ছিল, সে পালাতে চাইছে। লিখন আর এগোয়নি। পালাতে দিল পদ্মজাকে। মগা বলেছে, পদ্মজার লোকসমাজের ভয় খুব। তাই লিখন এই নির্জন মাঠের পাশে বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা এ পথ দিয়েই বাড়ি ফিরবে। তখন যদি একটু কথা বলা যায়।

পদ্মজা জড়সড় হয়ে হাঁটছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। বার বার জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে।
পদ্মজা মিনমিনে গলায় পূর্ণাকে ডাকল, 'পূর্ণা রে...”

পূর্ণা তাকাল। পদ্মজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে। উনি মাঝপথে দাঁড়িয়ে নেই তো?'

পূর্ণা চরম বিরক্তি নিয়ে বলল, 'থাকলে কী হয়েছে? খেয়ে ফেলবে?'

পদ্মজা আর কথা বলল না। পূর্ণার সাথে কথা বলে লাভ নেই। তখন লিখন শাহকে পাত্তা না দেয়ার জন্য পূর্ণার খুব রাগ হয়েছে। পদ্মজা বরাবরই মাথা নিচু করে হাঁটে। তাই লিখন শাহকে দেখতে পেল না। পূর্ণা দূর থেকে দেখতে পেল। কিন্তু এইবার আর আগে থেকে বলল না পদ্মজাকে। সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

ভাবে, লিখন শাহ্ যখন আপার সামনে এসে দাঁড়াবে কী যে হবে!

লিখন-পদ্মজার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। তখন পদ্মজা আবিষ্কার করল লিখনের উপস্থিতি। ওড়নার ঘোমটা চোখ অবধি টেনে নেয় দ্রুত। ভয়ে-লজ্জায় সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরে। লিখনের পাশ কাটার সময় পুরুষালি একটি কণ্ঠ ডেকে উঠল, 'পদ্ম।'

পদ্মজা দাঁড়াতে চায়নি। তবুও কেন জানি দাঁড়িয়ে গেল। লিখন দুয়েক পা এগিয়ে আসল। পূর্ণা ঠোঁট টিপে সেই দৃশ্য গিলছে। লিখন উসখুস করছে। কথা গুলিয়ে ফেলেছে। পদ্মজা

লিখনকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। লিখন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখল। পূর্ণা বলল, ‘আমাকে বলুন, আমি বলে দেব।’

লিখন পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। এরপর অনুরোধ স্বরে বলল,’দয়া করে, তোমার বোনকে দিও। আমি কাল বিকেলে ঢাকা চলে যাব।’
পূর্ণা হাসিমুখে চিঠি নিল। এরপর বলল, ‘আপা আপনার আগের চিঠিটা প্রতিদিন পড়ে।’

লিখনের ঠোঁট দু’টি হেসে উঠল। পূর্ণা দৌড়ে ছুটে গেল পদ্মজার দিকে। লিখন আর পিছু নিল না। পূর্ণা

আসতেই পদ্মজা ধমকে উঠল, ‘কী কথা বলছিলি এতো? কেউ দেখলে কী হতো? তুই আম্মার কথা কেন ভাবছিস না।’

পদ্মজার কাঁদোকাঁদো স্বরে পূর্ণা চুপসে গেল। সত্যি কী সে বেশি করে ফেলল? পূর্ণা চোখ নামিয়ে চুপচাপ হেঁটে বাড়ি চলে আসে। চিঠির কথা পদ্মজাকে বলা হয়নি।

____

গোধূলি বিকেল। হেমলতা পদ্মজাকে ফরমায়েশ দেন, ‘পদ্ম, কয়টা টমেটো নিয়ে আয়।’
‘আচ্ছা আম্মা।’

পদ্মজা লাহাড়ি ঘরের ডান দিকে হেঁটে আসে। দু'মাস আগে মোর্শেদ এ'দিকের সব ঝোপজঙ্গল সাফ করে টমেটোর ছোটখাটো ক্ষেত করেছেন। লাল টকটকে টমেটো। হেমলতা রান্নার ফাঁকে বারান্দার দিকে উঁকি দিলেন। মোর্শেদ আর প্রান্ত কিছু নিয়ে বৈঠক করছে।

হেমলতা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। বাসন্তী নামক মানুষটা কী জন্যে ত্যাগের স্বীকার হলো? জানতে ইচ্ছে করলেও হেমলতা প্রশ্ন করেন না। তবু এতটুকু বুঝেছেন মোর্শেদের বাইরের ঘোর কেটে গেছে। যার ফলস্বরূপ সংসারে তার মন পড়েছে। হেমলতাকে

খুব সমীহ করে চলেন। তবে হেমলতা জানেন, মোর্শেদ পদ্মজাকে নিজের মেয়ে হিসেবে এখনো বিশ্বাস করেননি। তা নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁচা দিতেও ভুলেন না।

পদ্মজা সাবধানে ক্ষেতের মধ্যিখানে আসল। টমেটো ছিঁড়তে গিয়ে তার লিখনের কথা মনে হলো। মনে মনে ভাবে, কেন এসেছেন তিনি? কি বলতে চেয়েছিলেন?
জানার জন্য পদ্মজার মনটা ব্যকুল হয়ে হয়ে উঠল।

‘আপা,একটা কথা বলি?’

পদ্মজা চমকে তাকাল। হঠাৎ পূর্ণার আগমনে ভয় পেয়েছে। বুকে ফুঁ দিয়ে বলল, ‘বল।’

‘রাগ করবে না তো?’

পদ্মজা চোখ ছোট ছোট করে তাকাল। বলল, ‘করব না।’

পূর্ণা লিখনের দেয়া চিঠি দেখিয়ে বলল, ‘লিখন ভাইয়ার চিঠি।’

পদ্মজা ছোঁ মেরে চিঠি নিল। পূর্ণা অবাক হলো। মনে মনে খুশি হলো পদ্মজার আকুলতা দেখে। পদ্মজা দ্রুত চিঠির ভাঁজ খুলল। পূর্ণা বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছে, কেউ আসছে নাকি! পদ্মজা পড়া শুরু করল।

প্রিয় পদ্ম ফুল,

চার মাস কেটে গেল। চার মাসে একটুর জন্যও অবসর মেলেনি। কিন্তু মনে ছিল এক আকাশ ছটফটানি। তোমার মনের কথা তো জানাই হলো না। তোমাদের অলন্দপুরের প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছেলের স্বপ্ন তোমাকে ঘরে তোলার। তাই সারাক্ষণ ভয়ে ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ তুলে নেয়নি তো! তিন দিনের সময় নিয়ে চলে এসেছি। শুধু একবার দেখতে আর জানতে, তুমি কী আমার জন্য অপেক্ষা করবে? মেট্রিক পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করলেই হবে। এরপর আমি

আমার মা আর বাবাকে নিয়ে তোমার মায়ের কাছে আসব। উনার কাছে অনুরোধ করব, তোমার পড়া শেষ হলে যেন আমার সাথেই বিয়ে দেন। তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব। এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছি। আমি গুছিয়ে লিখতে পারছি না আজ। কয়েকটা চিঠি লিখেছি। একটাও মনমতো হয়নি। অনুগ্রহ করে তুমি মানিয়ে নিও।

ইতি

লিখন শাহ্

____

বাড়ির সবাই ঘুমে। পদ্মজা চুপিচুপি উঠে বসল পড়ার টেবিলে। রাত

অনেক। গাছের পাতায় নিশ্চয় শিশির বিন্দু জমছে। এরপর ভোররাতে টিনের চালে শিশিরকণা বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির মতো ঝরবে। গাঁ হিম করা ঠান্ডা। তা উপেক্ষা করে পদ্মজা হাতে কলম তুলে নিল। সাদা কাগজে লিখল, অপেক্ষা করব আমি। এরপর কাগজটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল।

ফজরের নামায পড়ে চার ভাইবোন পড়তে বসল। পড়ায় মন টিকছে না পদ্মজার। বই আনার ছুতোয় পদ্মজা রুমে গেল। রাতের লেখা কাগজটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালার বাইরে

ফেলে দিল। এরপর আবার নতুন করে লিখল, আমার আম্মা যা চান তাই হবে।

পড়াশেষে নিয়মমাফিক ঘাটে আসল পদ্মজা। হাতের মুঠোয় তিনটা চিঠি। দু'টো লিখনের। একটা তার লেখা। পূর্ণাও পাশে। প্রেমা, প্রান্ত বাড়িজুড়ে ছুটাছুটি করছে। সামনের কোনোকিছু ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সবকিছুই অস্পষ্ট। কুয়াশার স্তর এত ঘন যে, দেখে মনে হচ্ছে সামনে কুয়াশার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড় ভেদ করে একটা নৌকা এসে ঘাটে ভীরে। নৌকায় লিখন আর মগা। আকস্মিক ঘটনায় পদ্মজার পিল উঠল

চমকে। পালানোর মতো শক্তিটুকু পায়ে নেই।

লিখন মায়াভরা কণ্ঠে পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলল, ‘আমি বাধ্য হয়ে এসেছি। আজ বিকেলে চলে যাব। মগা বলল, প্রতিদিন সকালে ঘাটে নাকি বসো তুমি। তাই এসেছি।’

পদ্মজা মনে মনে সূরা ইউনুস পড়ছে। ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। মা দেখে ফেললে কী হবে? বা অন্য কেউ? একটু সাহস যোগাতেই নিজের লেখা চিঠি সিঁড়িতে রেখে, পদ্মজা ছুটে গেল বাড়িতে। পূর্ণা বড় বড় চোখে শুধু দেখল। লিখন নৌকা থেকে নেমে

চিঠিটা হাতে তুলে নিল। ভাঁজ খুলে একটা লাইন পেল শুধু। লিখনের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। পূর্ণার কৌতূহল হলো চিঠিতে কী আছে জানার জন্য। তবে তা প্রকাশ করল না। শুধু বলল, ‘আপা আপনার কথা প্রতিদিন ভাবে।’

১৯৯৬ সাল। পদ্মজা থেমে থেমে কাঁপছে। হাঁটুর উপর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। তুষার কালো চাদর তার গায়ে টেনে দিল। পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। বিষাদভরা কণ্ঠে বলল, ‘ সেদিন আমার লেখা প্রথম চিঠিটা কুটিকুটি কেন

করেছি,জানি না। ইচ্ছে হয়েছিল তাই করেছি। তবে জানেন, আমি একদম ঠিক করেছিলাম। সেদিন যদি আমি কথা দিয়ে দিতাম। আমার কথা ভঙ্গ হতো।’

পদ্মজা হাসল। তুষার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পদ্মজার দিকে। এরপর বলল, ‘লিখনের সাথে আর দেখা হয়নি?’

পদ্মজা হাতের কাঁটা অংশে ফুঁ দিয়ে বলল, ‘হয়েছিল।’

‘তাহলে, কথা ভঙ্গ হতো কেন বললেন?’

পদ্মজা তুষারের দিকে তাকাল। এরপর আবার হাঁটুতে মুখ লুকালো। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট করে করে দশ মিনিট কেটে গেল। পদ্মজার সাড়া নেই। তুষার ডাকল, 'পদ্মজা? শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

'আপনার কী কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'মুখ তুলে তাকান।'

পদ্মজা ছলছল চোখে তাকাল। তুষার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কী সমস্যা হচ্ছে?'

তুষারের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে পদ্মজা ভেজা কণ্ঠে বলল, 'আমার আম্মা

আমার সাথে কেন বিশ্বাসঘাতকতা করল?’

তুষার চমকাল। হেমলতা নামে মানুষটার সম্পর্কে যা জানল, তাতে তার নামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটা যায় না। পরপরই নিজেকে সামলে নিল। এমন কেইস শত শত আছে। ভাল মানুষের খারাপ রূপ। তুষার সাবধানে প্রশ্ন করল, ‘কী করেছেন তিনি?’

পদ্মজা উত্তর দিল না। ফ্লোরে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। তুষার গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পদ্মজা এখন আর কিছু বলবে না। সে ক্লান্ত। অতীত

হাতড়াতে গিয়ে মনের অসুস্থতা বেড়ে গেছে তার। তুষার পদ্মজার মুখের দিকে তাকাল। আঁচল সরে গেছে বুক থেকে। চাদরের অংশ ফ্লোরে পড়ে আছে। তুষার চাদরটা টেনে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, পদ্মজার গলায় কালো-খয়েরি মিশ্রণে কয়টা দাগ। গলা টিপে ধরার দাগ! তুষার হুংকার ছাড়ল, 'ফাহিমা?'

ফাহিমা কাছেই ছিল। ছুটে আসল। তুষার বলল, 'আপনি আসামীর গলা টিপে ধরেছেন?'

ফাহিমা চট করে বলল, 'না, স্যার। প্রথম থেকেই গলায় দাগ গুলো

দেখছি। প্রশ্নও করেছি। মেয়েটা উত্তর দিল না।'

তুষার কপাল ভাঁজ করে ফেলল। হাজারটা প্রশ্নে মাথা ভনভন করছে। মস্তিষ্ক শূন্য প্রায়। পদ্মজা যতটুকু বলেছে তার পরবর্তী সাত বছরে কী কী হয়েছিল, না জানা অবধি শান্তি মিলবে না। মাথা কাজ না করলে তুষার সিগারেট টানে। তাই বেরিয়ে গেল।

চলবে...